

হজের পদ্ধতি

বাংলা

بنغالي

صِفَةُ الحَجِّ



লেখক: সম্মানিত শাইখ আল্লামা
মুহাম্মাদ বিন সালিহ আল-উসাইমিন

আল্লাহ তা'আলা তাঁকে, তাঁর পিতামাতা এবং মুসলিমদেরকে ক্ষমা করুন

صِفَةُ الحَجِّ

হজের পদ্ধতি

بِقَلَمِ فَضِيلَةِ الشَّيْخِ العَلَّامَةِ
مُحَمَّدِ بْنِ صَالِحٍ العُثَيْمِينِ
غَفَرَ اللَّهُ لَهُ وَلِوَالِدَيْهِ وَلِلمُسْلِمِينَ

লেখক: সম্মানিত শাইখ আল্লামা
মুহাম্মাদ বিন সালিহ আল-উসাইমিন
আল্লাহ তা'আলা তাঁকে, তাঁর পিতামাতা এবং
মুসলিমদেরকে ক্ষমা করুন

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

হজের পদ্ধতি

লেখক: সম্মানিত শাইখ আল্লামা
মুহাম্মাদ বিন সালিহ আল-উসাইমিন

আল্লাহ তা'আলা তাঁকে, তাঁর পিতামাতা এবং মুসলিমদেরকে ক্ষমা করুন।

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, আমি সালাত ও সালাম পাঠ করছি আমাদের নবী মুহাম্মাদ, তার পরিবারবর্গ ও সকল সাহাবীগণের ওপর। অতঃপর:

আমি আমার ভাইদের কাছে হজের মৌসুমের আগমন উপলক্ষে হজ সম্পর্কিত কিছু কথা সহজভাবে উপস্থাপন করতে চাই। আল্লাহর কাছে আশা রাখি যে, তিনি আমাদের সকলের আমলকে তাঁর সন্তুষ্টির জন্য খালেস করে দেবেন এবং তা যেন উপকারী ও তাঁর নৈকট্য অর্জনের মাধ্যম হয়; নিশ্চয় তিনি দানশীল ও দয়ালু।

হজ সম্পর্কিত আলোচনার সারসংক্ষেপ নিম্নরূপ:

১. ভ্রমণ (সফর) সংক্রান্ত বিধান।

২. হজ কখন ফরয হয়েছিল এবং কার উপর এটি ফরয?

৩. হজ বা উমরাহ করতে ইচ্ছুক ব্যক্তি কোন স্থান থেকে ইহরাম করবে?

৪. হজের প্রকারভেদ এবং তার মধ্যে সর্বোত্তম

প্রকার।

৫. তামাত্তু হজের পদ্ধতি: উমরাহর ইহরাম থেকে শুরু করে হজ সম্পন্ন করা পর্যন্ত সংক্ষিপ্ত বর্ণনা।

৬. বিদায়ী তাওয়াফ।

৭. ইহরাম অবস্থায় নিষিদ্ধ কাজসমূহ।

৮. এই নিষিদ্ধ কাজগুলো করলে তার বিধান।

৯. মসজিদে নববীর যিয়ারত।

ভ্রমণ (সফর) সংক্রান্ত বিধানাবলী:

যেহেতু হজের জন্য সফর অপরিহার্য, বরং এটি নিজেই একটি সফর, তাই এখানে সফর সংক্রান্ত কিছু বিধান আলোচনা করা গুরুত্বপূর্ণ। সফরের কিছু বিশেষ বিধান রয়েছে, যার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো সালাত সংক্রান্ত বিধান, যা সংক্ষিপ্তভাবে নিম্নরূপ:

(ক) পবিত্রতা সম্পর্কে:

মুসাফিরের জন্য আবশ্যক হলো পানি দিয়ে ওযু ও গোসল করে পবিত্রতা অর্জন করা- যদি পানি পাওয়া যায়। কিন্তু যদি পানি না পায়, তাহলে পবিত্র মাটি দিয়ে তায়াম্মুম করবে। সে মাটিতে একবার হাত মারবে, তারপর সমস্ত মুখমণ্ডল এবং দুই হাতের আঙুলের ডগা থেকে কবজি পর্যন্ত মাসেহ করবে। কবজি হলো, হাতের তালু ও বাহুর সংযোগস্থল।

এভাবে সে পূর্ণরূপে পবিত্র হবে। তায়াম্মুম সেই কারণে ভঙ্গ হবে যে কারণে পানির পবিত্রতা ভঙ্গ হয় অথবা পানি পাওয়া গেলে ভঙ্গ হবে। কাজেই, যদি কেউ

যোহরের সালাতের জন্য তায়াম্মুম করে এবং আসর পর্যন্ত তার পবিত্রতা অক্ষুণ্ণ থাকে, তাহলে সে নতুন তায়াম্মুম ছাড়াই আসরের সালাত আদায় করবে। একইভাবে মাগরিব ও ইশার সালাতের সময়ও যদি উক্ত পবিত্রতা অবস্থায় থাকে তখনও পূণরায় তায়াম্মুম ছাড়াই সালাত আদায় করতে পারবে।

যদি মুসাফিরের উপর জানাবত (গোসল ফরয অবস্থা) সৃষ্টি হয় এবং সে গোসলের পানি না পায়, তাহলে তায়াম্মুম করলে তার জানাবত দূর হয়ে যাবে। কিন্তু পরে যদি পানি পাওয়া যায়, তাহলে জানাবত ফিরে আসবে এবং তার উপর গোসল ফরয হবে। অনুরূপভাবে, যদি পেশাব বা পায়খানার কারণে ওযু ভঙ্গ হয় এবং পানি না পাওয়া যায়, তাহলে তায়াম্মুম করলে পবিত্রতা হাসিল হবে। কিন্তু পরে পানি পাওয়া গেলে অপবিত্র অবস্থা ফিরে আসবে এবং ওযু করা আবশ্যক হবে। কারণ হাদীসে এসেছে:

«الصَّعِيدُ الطَّيِّبُ وَضُوءُ المُسْلِمِ وَإِنْ لَمْ يَجِدِ المَاءَ عَشْرَ سِنِينَ، فَإِذَا وَجَدَ المَاءَ فَلْيَتَّقِ اللهَ، وَلْيُمِسَّهُ بَشَرَتَهُ».

"পবিত্র মাটি হলো মুসলিমের অযুর মাধ্যম, যদিও সে দশ বছর ধরে পানি না পায়। যদি সে পানি পায়, তাহলে সে যেন আল্লাহকে ভয় করে এবং তা যেন তার চামড়ায় স্পর্শ করে।" অন্য হাদীসে এসেছে:

«طَهُورُ الْمُسْلِمِ».

"(পবিত্র মাটি হলো) মুসলিমের পবিত্রতার মাধ্যম।" মুসনাদে আহমাদ। আর তিরমিযী হাদীসটিকে হাসান সহীহ বলেছেন।[1] আর মুসাফির ব্যক্তি তার মোজার উপর তিন দিন তিন রাত মাসেহ করতে পারবে। অন্যদিকে, মুকীম ব্যক্তি (যে মুসাফির নয়) মোজার উপর এক দিন এক রাত মাসেহ করতে পারবে।

(খ) ফরয সালাত সম্পর্কে:

মুসাফির ব্যক্তি চার রাকআত বিশিষ্ট ফরয সালাত- যেমন: যোহর, আসর ও ইশা- কেবল দুই রাকআত আদায় করবে। এ বিধান তার নিজ শহর থেকে বের হওয়ার মুহূর্ত থেকে শুরু করে ফিরে আসা পর্যন্ত প্রযোজ্য, তা সে স্বল্প সময়ের জন্য সফর করুক বা দীর্ঘ সময়ের জন্য। সহীহ বুখারীতে হযরত আনাস ইবনে মালিক রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন:

"خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ من المدينة إِلَى مَكَّةَ (يعني: في حجة الوداع)، فَكَانَ

[1] আবু দাউদ (অধ্যায়: পবিত্রতা, পরিচ্ছেদ: জানাবতের অবস্থায় তায়াম্মুম করা, হাদিস নং ৩৩২), তিরমিজি (অধ্যায়: পবিত্রতা, পরিচ্ছেদ: জানাবতের জন্য তায়াম্মুম বিষয়ে বর্ণিত হাদিসসমূহ, হাদিস নং ১২৪), নাসাঈ (অধ্যায়: পবিত্রতা, পরিচ্ছেদ: এক তায়াম্মুম দিয়ে একাধিক নামাজ আদায়, হাদিস নং ৩২৩), এবং আহমাদ (মুসনাদ, খণ্ড ৫/ পৃষ্ঠা ১৪৬) — আবূ যার (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। আর উপরের প্রথমোক্ত বর্ণনাটি বায্যার (খণ্ড ৯/ পৃষ্ঠা ৩৮৭, হাদিস নং ৩৯৭৩) থেকে।

يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ، حَتَّى رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ. قُلْتُ: أَقَمْتُمْ بِمَكَّةَ شَيْئًا؟ قال: أَقَمْنَا بِهَا عَشْرًا".

"আমরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সঙ্গে মদিনা থেকে মক্কায় গমণ করি (অর্থাৎ বিদায় হজের সময়)। আমরা মদিনা ফিরে আসা পর্যন্ত তিনি দু'রাকা'আত, দু'রাকা'আত সালাত আদায় করেছেন। (রাবী বলেন) আমি বর্ণনাকারী আনাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুকে বললাম: আপনারা মক্কায় কত দিন ছিলেন? তিনি বললেন: আমরা সেখানে দশ দিন ছিলাম "[1]

এ বিষয়ে 'আয়িশাহ রাদিয়াল্লাহু 'আনহা হতে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেছেন: "আল্লাহ তা'আলা যখন সালাত ফরয করেছেন তখন স্বগৃহে (মুকীম) থাকাবস্থায় এবং সফরে থাকাবস্থায় দু' দু'রাকআত করেই ফরয করেছেন। অতঃপর সফর অবস্থার সালাতের রাক'আত সংখ্যা ঠিকই রাখা হয়েছে এবং স্বগৃহে থাকাবস্থার সালাত দু'রাকআত বাড়ানো হয়েছে "[2]

তার থেকে অন্য একটি বর্ণনায় এসেছে: "(মিরাজের রাতে) দু' রাক্'আতই সালাত ফরয ছিল। এরপর

---

1 সহীহ বুখারী, (অধ্যায়: নামাজ কসর করা, পরিচ্ছেদ: কসর করার বিষয়ে বর্ণিত হাদিসসমূহ, হাদিস নং ১০৮১), এবং মুসলিম (অধ্যায়: মুসাফিরের নামাজ ও তা কসর করার বিধান, হাদিস নং ৬৯৩)।

2 সহীহ বুখারী, (অধ্যায়: নামাজ, পরিচ্ছেদ: মিরাজে নামাজ কীভাবে ফরজ হলো?, হাদিস নং ৩৫০), এবং মুসলিম (অধ্যায়: মুসাফিরের নামাজ ও তা কসর করার বিধান, হাদিস নং ৬৮৫)।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হিজরত করলে মুক্বীমের জন্য চার রাক্‌’আত সালাত নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়েছে। আর সফর অবস্থায় প্রথম থেকেই দু’ রাক্‌’আত ফরয ছিল।”[1]

সহীহ মুসলিমের বর্ণনায় রয়েছে: “কিন্তু সফরের সালাত প্রথম অবস্থায়র উপরই (দু’ রাক্‌’আতে) রাখা হয়।”[2]

আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে এমন একটি ঘটনাও বর্ণিত হয়নি যে, তিনি সফর অবস্থায় কখনো চার রাকআত পূর্ণ সালাত আদায় করেছেন। এজন্যই বহু আলেমের মতে, মুসাফিরের জন্য চার রাকআতের সালাত দুই রাকআতে সংক্ষেপ (কসর) করা ওয়াজিব। সহীহ বুখারীতে আব্দুর রহমান ইবনে ইয়াযীদ (রহ.) থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন: “উসমান ইবনু ‘আফফান রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু আমাদেরকে নিয়ে মিনায় চার রাক‘আত সালাত আদায় করেছেন। অতঃপর এ সম্পর্কে ‘আব্দুল্লাহ ইবনু মাস‘ঊদ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুকে বলা হলো, তিনি প্রথমে ‘ইন্না লিল্লাহ্‌’ পড়লেন। অতঃপর বললেন, আমি আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর সঙ্গে মিনায় দু‘ রাক‘আত পড়েছি, আবূ বকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুর সাথেও মিনায় দু’ রাকাআত সালাত

---

[1] সহীহ বুখারী, (অধ্যায়: গুণাবলি ও মর্যাদা, পরিচ্ছেদ: মুসলিমরা কখন থেকে ইতিহাস গণনা শুরু করেছেন?, হাদিস নং ৩৯৩৫)।

[2] সহীহ মুসলিম, অধ্যায়: মুসাফিরের সালাত, হাদীস নং (২/৬৮৫)

আদায় করেছি এবং ‘উমার ইবনু খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুর সঙ্গে মিনায় দু’রাক‘আত পড়েছি। যদি চার রাক‘আতের পরিবর্তে দু’রাক‘আত মাকবূল সালাত হতো, তাহলে কতই না ভালো হতো।”[1]

অতএব, দেখা যাচ্ছে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু সফর অবস্থায় হযরত উসমান রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু -এর পূর্ণ সালাত আদায় করাকে মুসীবত হিসেবে গণ্য করেছিলেন। তিনি এতে "ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন" পড়েন এবং এর বিপরীতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর দুই সাহাবী আবু বকর ও উমার রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুমা-এর সুন্নাহ বর্ণনা করেন।

আর উসমান রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু তার খিলাফতের ছয় বা আট বছর মিনায় সালাত কসর করেছেন, কিন্তু পরে তিনি পূর্ণ সালাত আদায় শুরু করেন। সহীহ মুসলিমে হযরত ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুমা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হজ্জের সময় মিনাতে অবস্থানকালে মুসাফিরের ন্যায় দু’ রাকাআত সালাত আদায় করেছেন। অতঃপর আবূ বকর, উমার এবং উসমান রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুও আট বছর বা ছয় বছর যাবৎ তাই

---

[1] সহীহ বুখারী, অধ্যায়: সালাত কসর করা, পরিচ্ছেদ: মিনায় সালাত, হাদীস নং (১০৮৪); মুসলিম, অধ্যায়: মুসাফিরের সালাত, পরিচ্ছেদ: মিনায় সালাত কসর করা, হাদীস নং (৬৯৫)।

করেছেন।[1] আর তার (উসমান রাদিয়াল্লাহু 'আনহু) পূর্ণ সালাত আদায় করা ছিল একটি ব্যাখ্যার ভিত্তিতে যা তিনি গ্রহণ করেছিলেন। তবে এই ব্যাখ্যা সম্পর্কে বিভিন্ন বর্ণনা ও আলেমদের মতামতের মধ্যে ভিন্নতা রয়েছে।

তবে যদি কোনো মুসাফির ব্যক্তি এমন ইমামের পিছনে সালাত আদায় করে যে পূর্ণ সালাত আদায় করছে (অর্থাৎ কসর করছে না), তাহলে উক্ত মুসাফিরের জন্য পূর্ণ সালাত আদায় করা ওয়াজিব। সহীহ মুসলিমে হযরত মূসা ইবনে সালামা আল-হুযালী (রহ.)-থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুকে জিজ্ঞেস করলাম, আমি মক্কায় অবস্থানকালে যদি ইমামের পিছনে সালাত আদায় না করি, তাহলে কীভাবে সালাত আদায় করব? জবাবে তিনি বললেন: দু' রাকাআত সালাত আদায় করবে। এটি আবুল কাসিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সুন্নাত।[2]

এ বিষয়ে নাফে' রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: "ইবনু 'উমার রাদিয়াল্লাহু 'আনহু যখন ইমামের সঙ্গে সালাত আদায় করতেন, তখন চার রাক'আত পড়তেন, আর

---

1 সহীহ মুসলিম, অধ্যায়: মুসাফিরের সালাত, পরিচ্ছেদ: মিনায় নামাজ কসর করা, হাদীস নং: (৬৯৪/১৮)।

2 সহীহ মুসলিম, অধ্যায়: মুসাফিরের সালাত, পরিচ্ছেদ: মুসাফিরদের সালাত ও তার কসর, হাদীস নং (৬৮৮)।

যখন একাকী পড়তেন তখন দু' রাক'আত পড়তেন।"[1]

আর মুসাফির ব্যক্তি ইমামের সাথে সালাতের শুরু থেকেই শরীক হোক বা সালাতের মাঝামাঝি সময়ে যোগ দিক—উভয় ক্ষেত্রেই তাকে ইমামের অনুসরণ করে পূর্ণ সালাত আদায় করতে হবে। কারণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সকলের জন্যই বলেছেন:

«فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا، وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا».

"ইমামের সাথে যতটুকু পাও তা আদায় করবে, আর যা ছুটে যায় তা পূর্ণ করবে।"[2]

অন্যদিকে, মুসাফিরের জন্য যোহর ও আসর অথবা মাগরিব ও এশার সালাত একত্রে আদায় করা সুন্নত—যখন সে সফরে চলমান অবস্থায় থাকে। কারণ, সহীহ বুখারীতে এসেছে, ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন:

"كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَجْمَعُ بَيْنَ صَلَاةِ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ إِذَا كَانَ عَلَى ظَهْرِ

---

[1] সহীহ মুসলিম, অধ্যায়: সালাতুল মুসাফিরীন (মুসাফিরের সালাত), পরিচ্ছেদ: মিনায় নামাজ সংক্ষিপ্ত করার, হাদীস নং: (১৭/৬৯৪)।

[2] সহীহ বুখারী, অধ্যায়: আযান, পরিচ্ছেদ: নামাজের উদ্দেশ্যে দৌড়ানো অনুচিত, হাদীস নং: ৬৩৬; এবং পরিচ্ছেদ: কেউ যদি বলে—আমাদের নামাজ মিস হয়ে গেছে, হাদীস নং: ৬৩৫।

সহীহ মুসলিম, অধ্যায়: মসজিদসমূহ, পরিচ্ছেদ: ভদ্রতা ও শান্ত-শিষ্টভাবে নামাজে যাওয়া মুস্তাহাব, হাদীস নং: ৬০২ ও ৬০৩; আবূ হুরায়রা এবং আবূ কাতাদাহ রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা থেকে বর্ণিত হাদীস।

سَيْرٍ، وَيَجْمَعُ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ".

"রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সফরে দ্রুত চলার সময় যুহর ও 'আসরের সালাত একত্রে আদায় করতেন, আর মাগরিব ও 'ইশা একত্রে আদায় করতেন।"[1]

তবে, যদি মুসাফির ব্যক্তি কোনো স্থানে অবস্থান করে (অর্থাৎ চলমান না থাকে), তাহলে দুই সালাত একত্রে আদায় না করাই সুন্নত। কারণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিনায় অবস্থানকালে দুই সালাত একত্রে আদায় করতেন না, কেননা সেখানে তিনি অবস্থান করছিলেন। তবে কেউ যদি একত্রে আদায় করে, তাহলে অসুবিধা নেই—বিশেষত যখন এর প্রয়োজন হয়, যেমন: কোনো গুরুত্বপূর্ণ কাজ সম্পন্ন করার জন্য বা বিশ্রাম নেওয়ার জন্য। সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে আবু জুহাইফা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত হয়েছে যে,

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَرَجَ مِنْ قُبَّةٍ كَانَتْ لَهُ بِالأَبْطَحِ بِمَكَّةَ، قَالَ أَبُو جُحَيْفَةَ: خَرَجَ بِالْهَاجِرَةِ -يَعْنِي: شِدَّةَ الحَرِّ- إِلَى البَطْحَاءِ، فَتَوَضَّأَ، ثُمَّ صَلَّى الظُّهْرَ رَكْعَتَيْنِ، وَالعَصْرَ رَكْعَتَيْنِ، الحديث.

[1] সহীহ বুখারী, অধ্যায়: নামাজ কসর করার বিধান, পরিচ্ছেদ: সফরে মাগরিব ও এশার নামাজ একত্র করে আদায় করার আলোচনা, হাদীস নং: ১১০৭ (মুয়াল্লাক হিসেবে)।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুবা থেকে মক্কার দিকে বেরিয়ে গেলেন। আবূ জুহাইফাহ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন: একদিন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুপুর বেলায় -অর্থাৎ প্রচন্ড গরমের সময়- বাতাহার দিকে বেরিয়ে গেলেন। সে স্থানে অযু করে যুহরের দু’রাকাত ও আসরের দু’রাকাত সালাত আদায় করেন..হাদীস।[1]

সহীহ মুসলিমে সা‘ঈদ ইবনু যুবাইর রহ. এর সূত্রে ইবনু আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন:

جَمَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي سَفْرَةٍ سَافَرَهَا فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ، فَجَمَعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ، وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ، قَالَ سَعِيدٌ: فَقُلْتُ لِابنِ عَبَّاس: مَا أَرَادَ بِذَلِكَ؟ قَالَ: «أَرَادَ أَلَّا يُحْرِجَ أُمَّتَهُ».

তাবুক যুদ্ধকালে কোন এক সফরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একাধিক সালাত একসাথে আদায় করেছিলেন। তিনি যুহর ও আসর এবং মাগরিব ও ইশার সালাত একত্রে আদায় করেছিলেন। সাঈদ ইবনু যুহায়ের রহ. বর্ণনা করেছেন, আমি আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুকে

---

[1] সহীহ বুখারী, অধ্যায়: নবীদের শ্রেষ্ঠত্ব (মানাকিব), পরিচ্ছেদ: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বৈশিষ্ট্য, হাদীস নং: ৩৫৫৩। সহীহ মুসলিম, অধ্যায়: সালাত, পরিচ্ছেদ: নামাজরত ব্যক্তির সামনে সুতরা রাখা, হাদীস নং: ৫০৩।

জিজ্ঞেস করেছিলাম যে, তিনি কী কারণে এরূপ করেছিলেন? জবাবে তিনি বললেন: “রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার উম্মাতকে কষ্ট দিতে চাননি।”[1] মু‘আয ইবনু জাবাল রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে হুবহু এ রকম বর্ণনা রয়েছে।[2]

আর "يحرج أمته" (উম্মতকে কষ্টে ফেলা) বাক্যটির অর্থ হলো—তিনি উম্মতকে অসুবিধায় বা অস্বস্তিকর অবস্থায় ফেলতে চান না।

(গ) নফল সালাত সম্পর্কে:

মুসাফির ব্যক্তি মুকীমের মতো নফল সালাত আদায় করতে পারবে। যেমন: তাহাজ্জুদ, বিতর, দুহার সালাত, মাসজিদে প্রবেশের সালাত (তাহিয়্যাতুল মাসজিদ) এবং সূর্যগ্রহণের সালাত। সহীহ বুখারীতে এসেছে, আব্দুল্লাহ ইবনে উমার রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুমা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন:

"رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ إِذَا أَعْجَلَهُ السَّيْرُ يُؤَخِّرُ الْمَغْرِبَ فَيُصَلِّيهَا ثَلَاثًا، ثُمَّ يُسَلِّمُ، ثُمَّ قَلَّمَا يَلْبَثُ حَتَّى يُقِيمَ الْعِشَاءَ، فَيُصَلِّيهَا رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ يُسَلِّمُ، وَلَا يُسَبِّحُ بَعْدَ الْعِشَاءِ حَتَّى يَقُومَ مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ".

---

1 সহীহ মুসলিম, অধ্যায়: মুসাফিরদের সালাত, পরিচ্ছেদ: স্বগৃহে অবস্থানকালে দু' ওয়াক্তের সালাত একত্রে আদায়, হাদীস নং (৫১/৭০৫)।

2 সহীহ মুসলিম, অধ্যায়: মুসাফিরদের সালাত, পরিচ্ছেদ: স্বগৃহে অবস্থানকালে দু' ওয়াক্তের সালাত একত্রে আদায়, হাদীস নং (৭০৬)।

“আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখেছি, যখন সফরের গতি তাকে তাড়িত করত, তখন তিনি মাগরিব নামাজ বিলম্বিত করতেন, এরপর তা তিন রাকআত পড়তেন এবং সালাম ফিরিয়ে অল্প দেরি করেই ‘ইশার ইকামাত দেয়া হত এবং দু‘রাক‘আত আদায় করে সালাম ফিরাতেন। কিন্তু ‘ইশার পরে গভীর রাত না হওয়া পর্যন্ত (নফল) সালাত আদায় করতেন না।”[1]

সহীহাইনে সা‘ঈদ ইবন ইয়াসার রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি ‘আব্দুল্লাহ ইবনু ‘উমার রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুর সঙ্গে মক্কার পথে সফর করছিলাম। সা‘ঈদ রহ. বলেন: আমি যখন ফজর হয়ে যাবার ভয় করলাম, তখন সওয়ারি হতে নেমে পড়লাম এবং বিতরের সালাত আদায় করলাম। অতঃপর তার সঙ্গে মিলিত হলাম। তখন ‘আব্দুল্লাহ ইবনু ‘উমার রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু জিজ্ঞেস করলেন: তুমি কোথায় ছিলে? আমি বললাম, ভোর হয়ে যাবার ভয়ে সওয়ারি থেকে নেমে বিতর আদায় করেছি। তখন ‘আব্দুল্লাহ ইবনু ‘উমার রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বললেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মধ্যে কি তোমার জন্য উত্তম

[1] বুখারী, অধ্যায়: সালাত কসর করা, পরিচ্ছেদ: মাগরিব ও ইশা একত্রে আদায় করলে আযান দিবে, না ইকামাত? হাদীস নং (১১০৯); মুসলিম, সংক্ষিপ্তভাবে, অধ্যায়: মুসাফিরদের সালাত, পরিচ্ছেদ:সফরে অবস্থানকালে দু' ওয়াক্তের সালাত একত্রে আদায় জায়েয হওয়া প্রসঙ্গে, হাদীস নং (৭০৩)।

আদর্শ নেই? আমি বললাম: হ্যাঁ, আল্লাহর কসম! তিনি বললেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উটের পিঠে বিতরের সালাত আদায় করতেন।[1]

সহীহ বুখারী ও মুসলিমে আব্দুর রহমান ইবনু আবূ লায়লা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে আরো বর্ণিত, তিনি বলেন: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দু'হার সালাত আদায় করতে দেখেছেন বলে উম্মে হানী রাদিয়াল্লাহু 'আনহা ব্যতীত কেউ আমাকে বলেননি। তিনি বলেছেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা বিজয়ের দিন তার ঘরে আসেন এবং আট রাকআত সালাত আদায় করেন।[2]

সহীহ বুখারী ও মুসলিমে আরো এসেছে, আবু কাতাদাহ রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

«إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ، فَلَا يَجْلِسْ حَتَّى يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ».

"যখন তোমাদের কেউ মসজিদ প্রবেশ করবে, তখন

---

1 সহীহ বুখারী, অধ্যায়: বিতর, পরিচ্ছেদ: সওয়ারিতে বসে বিতরের সালাত আদায়, হাদীস নং (৯৯৯); সহীহ মুসলিম, অধ্যায়: মুসাফিরদের সালাত, পরিচ্ছেদ:সফরে অবস্থানকালে নফল সালাত সওয়ারির উপরে আদায় করা জায়েয হওয়া প্রসঙ্গে, হাদীস নং (৩৬/৭০০)।

2 সহীহ বুখারী, অধ্যায়: সালাত কসর করা, পরিচ্ছেদ: সফরে ফরয সালাতের পরে ব্যতীত অন্য সময়ে নফল সালাত আদায় করা, হাদীস নং (১১০৩); সহীহ মুসলিম, অধ্যায়: মুসাফিরদের সালাত, পরিচ্ছেদ: দুহার সালাত মুস্তাহাব হওয়া প্রসঙ্গে, হাদীস নং (৮০/৩৩৬)।

সে যেন দুই রাক‘আত সালাত না পড়া পর্যন্ত না বসে।”[1]

সহীহ বুখারী ও মুসলিমে আরো আছে, আয়িশা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা থেকে বর্ণিত, সূর্যগ্রহণের সালাতের ঘটনা সংক্রান্ত একটি হাদীসে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

«إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ، لَا يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمُوهما –يَعْنِي: مُنخَسِفَيْنِ– فَافْزَعُوا إِلَى الصَّلَاةِ».

“নিশ্চয় চন্দ্র ও সূর্য আল্লাহর দুটি নিদর্শন। আর এ দুটি কোন মানুষের জন্মের বা মৃত্যুর জন্য গ্রাসপ্রাপ্ত হয় না। অতএব, তোমরা যখন এরূপ কিছু দেখতে পাও, - অর্থাৎ চন্দ্রগ্রহণ ও সূর্যগ্রহণ- তখন তোমরা ভীতিসহ দ্রুত সালাতের প্রতি ধাবিত হও।”[2]

এ দুটি হাদীসে সাধারণভাবে বলা হয়েছে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এতে কোনো নির্দিষ্ট সময় কিংবা সফরের পরিবর্তে নিজ এলাকায় অবস্থানকালীন অবস্থা নির্দিষ্ট করে বলেননি।

সহীহ বুখারীতে এসেছে, জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ

---

1 সহীহ বুখারী, অধ্যায়: তাহাজ্জুদ, পরিচ্ছেদ: নফল সালাত দু রাক‘আত দু রাক‘আত করে পড়া, হাদীস নং (১১৬৩); সহীহ মুসলিম, অধ্যায়: সালাত, পরিচ্ছেদ: তাহিয়্যাতুল মাসজিদের সালাত পড়া মুস্তাহাব, হাদীস নং (৭১৪)।

2 সহীহ বুখারী, অধ্যায়: চন্দ্রগ্রহণ, পরিচ্ছেদ: চন্দ্রগ্রহণের সময় ইমামের খুতবা, হাদীস নং (১০৪৬); সহীহ মুসলিম, অধ্যায়: চন্দ্রগ্রহণ, পরিচ্ছেদ: চন্দ্রগ্রহণের সালাত, হাদীস নং (৯০১)।

রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন:

"كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي التَّطَوُّعَ وَهُوَ رَاكِبٌ فِي غَيْرِ الْقِبْلَةِ".

"নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সওয়ার অবস্থায় কিবলা ছাড়া অন্য দিকে মুখ করে নফল সালাত আদায় করেছেন।"[1]

আর 'التطوع' শব্দে যে 'ال' আছে, তা 'গোত্র বা প্রকার' বোঝাতেও হতে পারে এবং 'সমগ্রতা' বোঝাতেও হতে পারে। দ্বিতীয় অর্থটিকে এই দিকটি শক্তিশালী করে যে, মূলত নফল ইবাদতের বৈধতা বিদ্যমান থাকে—যতক্ষণ না তার নিষিদ্ধতার কোন প্রমাণ এসে উপস্থিত হয়। আমাদের জানা মতে, এই নিষিদ্ধতার প্রমাণ কেবলমাত্র যোহর, মাগরিব ও এশার সুন্নতে মোয়াক্কাদার ব্যাপারে এসেছে। যেমন, সহীহ মুসলিমে হাফস ইবন আসিম ইবন উমর ইবন খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: মক্কার রাস্তায় আমি ইবনু উমারের সহচর হলাম। তিনি আমাদের যোহরের সালাত দু' রাক'আত পড়ালেন। এরপর তিনি সামনে অগ্রসর হলেন, আমরাও তার সঙ্গে অগ্রসর হলাম। তারপর তিনি তার মনযিলে এসে বসলেন এবং আমরাও তার সঙ্গে বসলাম। এরপর যে স্থানে তিনি সালাত আদায় করেছিলেন, সে স্থানের প্রতি দৃষ্টি পড়লে তিনি দেখলেন, কিছু লোক দাঁড়ানো। তিনি বললেন, তারা

---

1 সহীহ বুখারী, অধ্যায়: সালাত কসর করা, পরিচ্ছেদ: সওয়ারিতে নফল সালাত আদায়, হাদীস নং (১০৯৪)।

সেখানে কি করছে? আমি বললাম, তারা নফল সালাত আদায় করছে। তিনি বললেন, আমি যদি নফল আদায় করতাম তাহলে আমি আমার ফরয সালাতকেই পূর্ণ করতাম। হে ভ্রাতুষ্পুত্র! আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সঙ্গে সফরে থেকেছি। কিন্তু (সফরে) মৃত্যু পর্যন্ত তিনি দু' রাক'আতের অতিরিক্ত আদায় করেননি। আমি আবূ বকর রাদিয়াল্লাহু 'আনহুর সঙ্গেও থেকেছি, তিনিও তার মৃত্যু পর্যন্ত দু' রাক'আতের অতিরিক্ত আদায় করেননি। আমি উমার রাদিয়াল্লাহু 'আনহুর সঙ্গেও ছিলাম। তিনিও মৃত্যু পর্যন্ত দু' রাক'আতের অতিরিক্ত সালাত আদায় করেনি। অতঃপর আমি উসমান রাদিয়াল্লাহু 'আনহুরও সঙ্গে ছিলাম। তিনিও (সফরে) মৃত্যু পর্যন্ত দু' রাক'আতের অতিরিক্ত সালাত আদায় করেননি। আর আল্লাহ তা'আলা বলেছেন: "নিশ্চয়ই রাসুলুল্লাহর মধ্যে রয়েছে তোমাদের জন্য উত্তম আদর্শ।"[1] [সূরা আল আহযাব, আয়াত: ২১]

ইতিপূর্বে মাগরিব ও এশার সালাত একত্রে আদায় সম্পর্কে তার বর্ণনা থেকে প্রমাণিত হয় যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সফরে এ দু'ওয়াক্তের

[1] সহীহ মুসলিম, অধ্যায়: মুসাফিরের সালাত, পরিচ্ছেদ: মুসাফিরের সালাত এবং তার কসর, হাদীস নং (৬৮৯); সহীহ বুখারীতে সংক্ষিপ্তাকারে, অধ্যায়: সালাত কসর করা, পরিচ্ছেদ: যে ব্যক্তি সফরে ফরয সালাতের পরে নফল সালাত পড়ে না, হাদীস নং (১১০১, ১১০২)।

সুনানে রাতিবাহ বা নিয়মিত সুন্নত আদায় করতেন না।[1]

ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুমা -এর বক্তব্য

"لو كنت مسبحًا لأتممت" (যদি আমি নফল আদায় করতাম, তবে আমি পূর্ণ করতাম) এর অর্থ হলো: যদি আমি ফরয সালাতের পরিপূরক হিসেবে নিয়মিত সুন্নত আদায় করতাম, তবে আমি তা পূর্ণ করতাম। এর প্রমাণ হলো যে, এর প্রমাণ হলো, হজরত ইবনু উমর (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে সহীহ সূত্রে বর্ণিত আছে যে, তিনি তার বাহনের ওপর নফল নামাজ পড়তেন, বিতর নামাজও আদায় করতেন, এবং তিনি এটাও বলতেন যে, নবী কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)–ও এমনই করতেন।

অন্যদিকে, ইমাম বুখারী (রহ.) তার সহীহ গ্রন্থে নিম্নোক্ত দুটি শিরোনাম রেখেছেন: ১. "যে ব্যক্তি সফরে ফরয সালাতের আগে ও পরে নফল আদায় করে না" ২. "যে ব্যক্তি সফরে ফরয সালাতের আগে-পরে ছাড়া অন্য সময় নফল আদায় করে"।

অন্যদিকে, ফজরের ২ রাকাত সুন্নত মুকীম অবস্থায় ও সফরে উভয় অবস্থায় আদায় করবে। কারণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অন্য যে কোনো নফলের চেয়ে এ দু'রাকাতের ব্যাপারে বেশি যত্নবান ছিলেন এবং কখনো তা ছাড়তেন না, যেমনটি সহীহ বুখারীতে আয়িশা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা থেকে বর্ণিত

---

[1] পূর্বে এটা উল্লেখ করা হয়েছে (পৃষ্ঠা: ৭)।

হয়েছে (ফাতহুল বারি ৩/৪২)।[1]

সহীহ মুসলিমে আবু কাতাদাহ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত হয়েছে যে,

أَنَّهُ كَانَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ، فَذَكَرَ قِصَّةَ نَوْمِهِمْ عَنْ صَلَاةِ الفَجْرِ حَتَّى طَلَعَتِ الشَّمْسُ، وَأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَهُمْ، فَسَارُوا عَنْ مَكَانِهِمْ، ثُمَّ نَزَلَ، فَتَوَضَّأَ، ثُمَّ أَذَّنَ بِلاَلٌ بِالصَّلَاةِ، فَصَلَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ صَلَّى الغَدَاةَ، فَصَنَعَ كَمَا يَصْنَعُ كُلَّ يَوْمٍ.

তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে ছিলেন এবং ফজরের সালাত আদায় না করে সূর্য উদয় হয়ে যাওয়া পর্যন্ত ঘুমিয়ে থাকার ঘটনা বর্ণনা করেছেন। তিনি বর্ণনা করেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নির্দেশে তারা অবস্থান স্থল থেকে সরে গেলেন। অতঃপর তিনি অবতরণ করলেন, ওযু করলেন, বিলাল রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু সালাতের আযান দিলেন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দু'রাকাত সুন্নত আদায় করলেন, এরপর ফজরের সালাত আদায় করলেন—যেভাবে তিনি প্রতিদিন

---

[1] সহীহ বুখারী, অধ্যায়: তাহাজ্জুদ, পরিচ্ছেদ: ফজরের দুই রাকাত সুন্নতের বিশেষ যত্ন নেয়া, হাদীস নং (১১৬৯); সহীহ মুসলিম, অধ্যায়: মুসাফিরের সালাত, পরিচ্ছেদ: ফজরের দুই রাকাত সুন্নত আদায়ের প্রতি উৎসাহ, হাদীস নং (৭২৪/৯৪)।

আদায় করতেন।[1]

সহীহ মুসলিমে আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকেও অনুরূপ বর্ণনা রয়েছে।[2]

আমরা মুসাফিরের নফল সালাত সম্পর্কে আলোচনা দীর্ঘ করেছি, কারণ কিছু লোক মনে করে যে সফর অবস্থায় কোনো নফল সালাত নেই। কিন্তু আমাদের আলোচনা থেকে স্পষ্ট হয়েছে যে, দলিল অনুযায়ী শুধুমাত্র যোহর, মাগরিব ও এশার সুনানে রাতিবাহ (নিয়মিত সুন্নত) ছাড়া অন্যান্য নফল সালাত সফরেও জারি রয়েছে। আল্লাহই তাওফিকদাতা।

মুসাফিরের জন্য সফরে বাহনে নফল সালাত আদায় করা জায়েয, এমনকি কিবলার দিকে মুখ না করে হলেও। যেমন সহীহ বুখারীতে জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুমা থেকে বর্ণিত হয়েছে:

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ نَحْوَ الْمَشْرِقِ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُصَلِّيَ الْمَكْتُوبَةَ -يعني: الفريضة- نَزَلَ، فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ .

“নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাওয়ারীর উপর থাকা অবস্থায় পূর্ব দিকে ফিরেও সালাত আদায় করেছেন। কিন্তু যখন তিনি ফরয সালাত আদায় করার ইচ্ছা করতেন, তখন তিনি সাওয়ারী থেকে নেমে যেতেন

---

[1] সহীহ মুসলিম, অধ্যায়: মাসাজিদ, পরিচ্ছেদ: ছুটে যাওয়া সালাতের কাযা, হাদীস নং (৬৮১)।

[2] সহীহ মুসলিম, অধ্যায়: মাসাজিদ, পরিচ্ছেদ: ছুটে যাওয়া সালাতের কাযা, হাদীস নং (৬৮০)।

এবং কিবলামুখী হতেন।”[1]

সফর সংক্রান্ত আরেকটি বিধান:

প্রত্যেক মুসাফিরের জন্য সঙ্গী রাখা উচিত- একাকীত্ব দূরীকরণ ও প্রয়োজন মেটানোর জন্য। তাই কোনো ব্যক্তির একা সফর করা উচিত নয়, তবে যদি আল্লাহর পথে জিহাদ বা অনুরূপ ধর্মীয় প্রয়োজন থাকে তবে ভিন্ন কথা।

সহীহ বুখারীতে আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুমা থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

«لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي الْوَحْدَةِ مَا أَعْلَمُ مَا سَارَ رَاكِبٌ بِلَيْلٍ وَحْدَهُ».

“যদি মানুষ জানত একাকী সফর করা সম্পর্কে আমি যা জানি, তাহলে কোন আরোহী রাতে একা সফর করত না।”[2]

প্রত্যেক মুসাফিরের উচিত তার নাম ও ঠিকানা সংবলিত পরিচয়পত্র সঙ্গে রাখা, যাতে দুর্ঘটনা বা অন্য কোনো অপ্রীতিকর ঘটনায় তাকে সনাক্তকরণ সম্ভব হয়।

সফর সংক্রান্ত আরেকটি বিধান:

কোনো নারীর জন্য মাহরাম ছাড়া ভ্রমণ করা জায়েয

---

[1] সহীহ বুখারী, অধ্যায়: সালাতে কসর করা, পরিচ্ছেদ: ফরয সালাতের জন্য সাওয়ারী থেকে অবতরণ করা, হাদীস নং (১০৯৯)।

[2] সহীহ বুখারী, অধ্যায়: জিহাদ, পরিচ্ছেদ: একাকী সফর করা, হাদীস নং (২৯৯৮)।

নয়—তা দূরবর্তী ভ্রমণ হোক বা নিকটবর্তী, হজ্জের জন্য হোক বা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে, সে যুবতী ও সুন্দরী হোক বা বৃদ্ধা ও সাধারণ হোক, তার সাথে আত্মীয় বা বান্ধবীরা থাকুক বা না থাকুক, নিরাপত্তার সম্ভাবনা থাকুক বা না থাকুক, তা বিমানে হোক বা অন্য কোনো বাহনে। সহীহ বুখারী ও মুসলিমে ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: "আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছি:

«لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ، وَلَا تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ»، فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ امْرَأَتِي خَرَجَتْ حَاجَّةً، وَإِنِّي اكْتُتِبْتُ فِي غَزْوَةِ كَذَا وَكَذَا، قَالَ ﷺ: «انْطَلِقْ، فَحُجَّ مَعَ امْرَأَتِكَ».

"কোন পুরুষ যেন অপর মহিলার সঙ্গে নিভৃতে অবস্থান না করে, কোন স্ত্রীলোক যেন কোন মাহরাম সঙ্গী ছাড়া সফর না করে।" এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! অমুক যুদ্ধের জন্য আমার নাম লেখা হয়েছে; কিন্তু আমার স্ত্রী হজ্জযাত্রী। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: 'তবে যাও তোমার স্ত্রীর সঙ্গে হজ্জ কর।'[1] নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি

[1] সহীহ বুখারী, অধ্যায়: জিহাদ, পরিচ্ছেদ: যার নাম জিহাদে যাওয়ার জন্য তালিকাভুক্ত করা হয়েছে আর তার স্ত্রী হজ্জে বের হওয়ার ইচ্ছা করলে অথবা তার কোন ওজর দেখা দিলে, তবে তাকে (তবে তাকে জিহাদ থেকে বিরত থাকার) অনুমতি দেওয়া হবে কি? হাদীস নং (৩০০৬), সহীহ মুসলিম, অধ্যায়: হজ্জ, পরিচ্ছেদ: মুহরিমসহ মহিলাদের সফর করা, হাদীস নং (১৩৪১)।

ওয়াসাল্লাম নারীদের মাহরাম ছাড়া ভ্রমণ করতে নিষেধ করেছেন। এ নিষেধাজ্ঞাকে তিনি কোনো নির্দিষ্ট ভ্রমণ, নির্দিষ্ট নারী বা নির্দিষ্ট অবস্থার সাথে সীমাবদ্ধ করেননি। এ ক্ষেত্রে তিনি ঐ স্বামীকে তার স্ত্রী সম্পর্কে বিশেষভাবে জিজ্ঞাসাবাদও করেননি।

আর মাহরাম হলো সেই ব্যক্তি যার সাথে নারীর বিবাহ চিরতরে হারাম - হয় রক্তের সম্পর্ক বা দুধপানের সম্পর্ক অথবা বৈবাহিক সম্পর্কের কারণে।

রক্তের সম্পর্ক ও দুধপানের সম্পর্কের কারণে মাহরাম ৭ জন:

১. পিতা ও ঊর্ধ্বতন পুরুষ (দাদা, প্রপিতামহ)
২. পুত্র ও নিম্নতন পুরুষ (নাতি, প্রনাতি)
৩. ভাই
৪. ভাতিজা ও তার নিম্নতন পুরুষ
৫. বোনের পুত্র, নাতি ও তার নিম্নতন পুরুষ
৬. চাচা ও তার ঊর্ধ্বতন
৭. মামা ও ঊর্ধ্বতন

শ্বশুরপক্ষীয় সম্পর্কের কারণে মাহরাম ৪ জন:

১. স্বামীর পিতা ও ঊর্ধ্বতন পুরুষ
২. স্বামীর পুত্র ও নিম্নতন পুরুষ
৩. মেয়ে, নাতিন বা নিম্নতন প্রনাতির স্বামী
৪. মায়ের স্বামী (যদি সহবাস হয়ে থাকে)

শর্ত হলো, মাহরামকে প্রাপ্তবয়স্ক ও সুস্থ জ্ঞানসম্পন্ন হতে হবে। নাবালক বা পাগল ব্যক্তি মাহরাম হিসেবে গণ্য হবে না।

অতএব, যদি কোনো নারী মাহরাম না পায়, তাহলে তার উপর হজ্জ ফরয নয়– কারণ, তখন সে হজ্জের সামর্থ্য রাখে না বলে গণ্য হবে।

হজ্জ কখন ফরয হয়েছিল?

হজ্জ ইসলামের ৯ম বা ১০ম হিজরীতে ফরয হয়েছিল- এটিই আলিমদের বিশুদ্ধ মত। কারণ হজ্জ ফরয হয়েছে আল্লাহর এ বাণী দ্বারা:

﴿...وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلۡبَيۡتِ مَنِ ٱسۡتَطَاعَ إِلَيۡهِ سَبِيلٗاۚ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ ٱلۡعَٰلَمِينَ﴾

“এবং সামর্থ্যবান মানুষের ওপর আল্লাহর জন্য বায়তুল্লাহতে হজ্জ করা ফরয। আর যে কেউ কুফরী করল সে জেনে রাখুক, নিশ্চয় আল্লাহ সৃষ্টিজগতের মুখাপেক্ষী নন।” [আলে ইমরান, আয়াত: ৯৭] সূরা আলে ইমরানের এই আয়াত নাজিল হয়েছিল ৯ম হিজরীতে, যখন বিভিন্ন প্রতিনিধি দল মদিনায় আসছিল।

হজ্জ ফরয হওয়াতে বিলম্বের হিকমত - আল্লাহই ভালো জানেন - হলো যে, এর আগ পর্যন্ত মক্কা (আল্লাহ তার মর্যাদা বৃদ্ধি করুন) কুরাইশ মুশরিকদের নিয়ন্ত্রণে ছিল। ফলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবায়ে কেরামের পূর্ণাঙ্গভাবে হজ্জ আদায় করা সম্ভব ছিল না। হুদাইবিয়ার উমরাহর ঘটনা তার সাক্ষী; যেখানে ৬ষ্ঠ হিজরীতে মুশরিকরা রাসূল সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তার সঙ্গীদের উমরা সম্পন্ন করতে বাধা দিয়েছিল।

হজ্জ প্রতিটি প্রাপ্তবয়স্ক, সুস্থ জ্ঞানসম্পন্ন এবং শারীরিক ও আর্থিকভাবে সক্ষম মুসলিমের উপর ফরয।

অপ্রাপ্তবয়স্কের ক্ষেত্রে: হজ্জ তার উপর ফরয নয়, তবে সে হজ্জ করলে তা সহীহ হবে এবং নফল হজ্জের সওয়াব পাবে। পরবর্তীতে প্রাপ্তবয়স্ক হলে তাকে ফরয হজ্জ আদায় করতে হবে, কেননা বালেগ হওয়ার পূর্বে তার হজ্জ ফরয হওয়ার আগেই সম্পন্ন হয়েছে। এটি এমনই যেমন কেউ ফরয সালাত তার নির্ধারিত সময়ের পূর্বেই আদায় করে নেয়।

আর্থিকভাবে অক্ষম ব্যক্তি (যেমন: গরীব বা দাস) এর উপর হজ্জ ফরয নয়, কারণ আল্লাহ তাআলা বলেন:

﴿...مَنِ ٱسۡتَطَاعَ إِلَيۡهِ سَبِيلٗاۚ...﴾

অর্থাৎ, "যার সেখানে পৌঁছার সামর্থ্য আছে" । যেহেতু এ ব্যক্তি সামর্থ্যবান নয়, তাই তার উপর হজ্জ ফরয নয়।

তবে শারীরিকভাবে অক্ষম ব্যক্তির ক্ষেত্রে:

যদি তার অক্ষমতা স্থায়ী হয় - যেমন বার্ধক্য বা দীর্ঘস্থায়ী রোগ-তবে সে অন্য কাউকে নিজের পক্ষ থেকে হজ্জ করতে নিযুক্ত করবে। আর যদি তার অক্ষমতা অস্থায়ী হয়-যেমন সাময়িক অসুস্থতা- তবে

সে সুস্থ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করবে, তারপর হজ্জ করবে। যদি সুস্থ হওয়ার আগেই মারা যায়, তবে তার রেখে যাওয়া সম্পদ থেকে তার পক্ষে হজ্জ করানো হবে।

যখন কোনো মুসলিমের উপর হজ্জ ফরয হয়, তখন তার জন্য দ্রুত তা আদায় করা আবশ্যক। কারণ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নির্দেশাবলী যদি সময়ের সাথে সীমাবদ্ধ না হয় এবং বিলম্বের সুযোগের ব্যাপারে কোনো প্রমাণ না থাকে, তবে তা তাৎক্ষণিকভাবে পালনীয়। ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা থেকে বর্ণিত হাদীসে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

«تَعَجَّلُوا إِلَى الْحَجِّ – يَعْنِي الْفَرِيضَةَ –، فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَا يَدْرِي مَا يَعْرِضُ لَهُ».

"তোমরা -ফরয- হজ দ্রুত সম্পন্ন করো। কারণ, তোমাদের কেউ জানে না যে, কখন তার উপরে কী অসুবিধা বা প্রতিবন্ধকতা আপতিত হবে।"[1] বর্ণনায় আহমদ, হাদীসের সনদে দুর্বলতা রয়েছে, তবে দ্রুত হজ সম্পন্ন করার অন্যান্য সাধারণ দলিলসমূহ এ হাদীসকে শক্তিশালী করে।

---

[1] মুসনাদ আহমদ (১/৩১৪)।

হজ্জ বা উমরাহ করার ইচ্ছাকারী ব্যক্তি কোন স্থান থেকে ইহরাম করবে?

যে ব্যক্তি হজ বা উমরা করতে চায়, সে ইহরাম বাঁধবে ঐ মীকাতসমূহ থেকে, যেগুলো রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নির্ধারণ করে দিয়েছেন; এবং এগুলোর সংখ্যা পাঁচটি:

১. যুল হুলাইফা (আবইয়ারে আলী নামে পরিচিত) - মদিনাবাসী এবং অন্যদের জন্য যারা এ স্থান অতিক্রম করে।

২. আল-জুহফা (এটি একটি ধ্বংসপ্রাপ্ত প্রাচীন গ্রাম, বর্তমানে মানুষ রাবিগ নামক স্থানকে এর বিকল্প হিসেবে গ্রহণ করে) - সিরিয়াবাসী এবং অন্যদের জন্য যারা এ স্থান অতিক্রম করে, যদি তারা এর আগে যুল হুলাইফা অতিক্রম না করে।

৩. ইয়ালামলাম (তিহামাহ অঞ্চলের একটি পাহাড় বা স্থান, সা'দিয়াহ নামেও পরিচিত) - ইয়েমেনবাসী এবং অন্যদের জন্য যারা এ স্থান অতিক্রম করে আসে।

৪. কারনুল মানাযিল (আস-সাইল নামেও পরিচিত) - নজদবাসী এবং অন্যদের জন্য যারা এ স্থান অতিক্রম করে আসে।

৫. যাতু ইর্ক (আদ-দ্বারীবাহ নামেও পরিচিত) - ইরাকবাসী এবং অন্যদের জন্য যারা এ স্থান অতিক্রম করে আসে।

যে ব্যক্তি হজ্জ বা উমরাহের ইচ্ছা নিয়ে এসব মীকাত

অতিক্রম করে, তার জন্য ইহরাম করা আবশ্যক।

যে ব্যক্তি আকাশপথে বা সমুদ্রপথে মীকাতের সমান্তরালে যায়, তার জন্য সমান্তরাল হওয়ার সময় ইহরাম করা আবশ্যক। বিমানবন্দরে অবতরণ বা বন্দরে নোঙর করা পর্যন্ত ইহরাম বিলম্ব করা জায়েয নয়, কারণ এটি আল্লাহর নির্ধারিত সীমা লঙ্ঘনের শামিল।

﴿...وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ﴾

"আর যারা আল্লাহর সীমারেখা অতিক্রম করে, তারাই যালিম।" [সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত: ২২৯]

আর যারা এই মীকাতগুলোর ভিতরে মক্কার কাছাকাছি কোনো স্থানে থাকে, তারা নিজেদের অবস্থান থেকে ইহরাম বাঁধবে। এমনকি যারা মক্কায় আছে, তারাও মক্কা থেকেই ইহরাম বাঁধবে — তবে শুধু হজের জন্য। কিন্তু উমরার জন্য, তারা হারাম এলাকার বাইরে থেকে ইহরাম বাঁধবে- অর্থাৎ তারা নিকটবর্তী হিল অঞ্চলে গিয়ে ইহরাম বাঁধবে। কেননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আব্দুর রহমান ইবনে আবু বকরকে বলেছিলেন:

«اخْرُجْ بِأُخْتِكَ -يعني: عَائِشَةَ- مِنَ الْحَرَمِ، فَلْتُهِلَّ بِعُمْرَةٍ».

"তোমার বোন (আয়েশা)-কে হারামের বাইরে নিয়ে যাও। তারপর সেখান থেকে যেন উমরাহর ইহরাম

বাঁধে।"[1]

যারা হজ্জ বা উমরাহ এর উদ্দেশ্য ছাড়া মীকাত অতিক্রম করে:

যারা ব্যবসা-বাণিজ্য, আত্মীয়-স্বজনের সাথে দেখা-সাক্ষাৎ বা জ্ঞানার্জন ইত্যাদির উদ্দেশ্যে মীকাত অতিক্রম করে, তাদের ইহরাম করা জরুরি নয়, কারণ হজ্জ-উমরাহ জীবনে একবারই ফরয। আর ইহরাম শুধুমাত্র হজ- উমরাহর জন্যই আবশ্যক।

হজ্জের প্রকার ও তন্মধ্যে সর্বোত্তম কোনটি:

হজ্জ তিন প্রকার: তামাত্তু, কিরান ও ইফরাদ।

১. তামাত্তু: হজের মাসসমূহে — অর্থাৎ শাওয়াল মাস শুরু হওয়ার পর — উমরার জন্য ইহরাম বাঁধা, এবং তা সম্পন্ন করার পর, একই বছরে পুনরায় হজের জন্য ইহরাম বাঁধা।

২. কিরান হজ হলো: একজন ব্যক্তি হজ ও উমরা একসাথে আদায় করার নিয়ত করে — অর্থাৎ, উভয়টির জন্য একসাথে ইহরাম বাঁধে। অথবা প্রথমে শুধু উমরার ইহরাম বাঁধে, তারপর তাওয়াফ শুরু করার আগেই হজকেও সেই ইহরামের অন্তর্ভুক্ত করে নেয়।

৩. ইফরাদ: শুধু হজ্জের জন্য ইহরাম করা।

---

[1] সহীহ বুখারী, অধ্যায়: হজ্জ, পরিচ্ছেদ: 'আল্লাহর বাণী, "হজ্জ হলো নির্দিষ্ট কয়েক মাসে" হাদীস নং (১৫৬০), মুসলিম, অধ্যায়: হজ্জ, পরিচ্ছেদ: 'ইহরামের পদ্ধতি বর্ণনা', হাদীস নং (১২১১/১২৩) আয়েশা রাদিয়াল্লাহু 'আনহার সূত্রে।

অধিকাংশ আলেমের মতে, মানুষ এই সব হজ্জের পদ্ধতির মধ্যে যেকোনো একটি বেছে নিতে পারে। তবে কোনটি উত্তম তা নিয়ে তাদের মধ্যে মতভেদ আছে। সবচেয়ে অধিক সঠিক মত হলো যে, তামাত্তু পদ্ধতিই উত্তম। কারণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার সাহাবাদেরকে এ পদ্ধতিতে হজ্জ করতে নির্দেশ দিয়েছেন এবং তাদেরকে এতে উৎসাহিত করেছেন। এছাড়াও এ পদ্ধতিতে আমল বেশি হয়, কেননা এতে উমরাহ ও হজ্জের সমস্ত কাজ পূর্ণভাবে আদায় করা হয়। আর যারা আগেভাগে মক্কায় পৌঁছেন, তাদের জন্য এ পদ্ধতি সহজতর, কেননা তারা উমরাহ ও হজ্জের মধ্যবর্তী সময়ে ইহরামমুক্ত অবস্থায় থাকতে পারেন।

তামাত্তু হজ্জে হাদি (কুরবানী) দেওয়া আবশ্যক, যা কিনা শুকরিয়া স্বরূপ, গুনাহের কাফফারা নয়। সাধারণ কুরবানীর জন্য যা যা জায়েয, তা দিয়েই এই হাদি দেওয়া যাবে, যেমন: একটি ছাগল বা উট/গরুর এক-সপ্তমাংশ। ঈদের দিন বা তার পরের তিন দিনের মধ্যে তা যবেহ করতে হবে। মিনা বা মক্কায় তা বিতরণ করবে এবং নিজেও তা থেকে খেতে পারবে। যদি হাদি দেওয়ার সামর্থ্য না থাকে, তাহলে হজ্জের সময় তিন দিন রোজা রাখবে (তা ঈদের পর তিন দিনের পর যেন না হয়) এবং বাড়ি ফিরে সাত দিন রোজা রাখবে।

কিরান হজ্জকারীর জন্যও তামাত্তু হজ্জকারীর মতো কুরবানী দেয়া বা তার বিকল্প হিসেবে রোযা রাখা আবশ্যক।

সংক্ষেপে তামাত্তু হজ্জের পদ্ধতি- উমরাহ থেকে হজ্জ এর শেষ পর্যন্ত:

(ক) উমরাহ:

১. উমরাহর ইহরাম করার ইচ্ছা করলে, জানাবাতের গোসলের মতো গোসল করবে, মাথা ও দাড়িতে সুগন্ধি ব্যবহার করবে এবং সাদা ইজার (শরীরের নিচের অংশের চাদর) ও রিদা (শরীরের উপরের অংশের চাদর)পরিধান করবে। মহিলারা যেকোনো পোশাক পরতে পারবে, তবে সাজসজ্জা প্রদর্শন করবে না।

২. এরপর যদি ফরয সালাতের সময় হয়, তাহলে ফরয সালাত আদায় করবে এবং তারপর ইহরাম করবে। যদি ফরয সালাতের সময় না হয়, তাহলে ওযুর সুন্নত হিসেবে দুই রাকাত সালাত আদায় করবে; ইহরামের সুন্নত হিসেবে নয়, কেননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে ইহরামের সুন্নত সালাত প্রমাণিত নয়।

৩. সালাত শেষে উমরাহর নিয়ত করবে এবং বলবে: “লাব্বাইকাল্লাহুম্মা লাব্বাইক, লাব্বাইকা লা শারীকা লাকা লাব্বাইক, ইন্নাল হামদা ওয়ান নি‘মাতা লাকা ওয়াল মুলক, লা শারীকা লাক, লাব্বাইকাল্লাহুম্মা ‘উমরাতান"। পুরুষরা এটি উচ্চস্বরে বলবে, আর মহিলারা নিচু স্বরে বলবে।

তাওয়াফ শুরু করা পর্যন্ত তালবিয়া পড়তে থাকা সুন্নাত, তারপর তা বন্ধ করবে।

৪. মক্কায় পৌঁছে তাওয়াফ শুরু করবে। হাজরে আসওয়াদের কাছে গিয়ে সম্ভব হলে (ভিড় না থাকলে) ডান হাত দিয়ে তা স্পর্শ করবে এবং চুমু দেবে। অন্যথায়, ইশারা করে তাকবীর বলবে।

এরপর সে বাম দিকে ঘুরবে, যাতে কাবা ঘর তার বাম পাশে থাকে। যখন সে 'রুকনে ইয়ামানী'-এর পাশ দিয়ে অতিক্রম করবে — যা 'হাজরে আসওয়াদ'-এর পরে শেষ কোণা — তখন যদি সহজ হয়, তাহলে ডান হাতে তা স্পর্শ করবে, কিন্তু চুম্বন করবে না।

সাত চক্করে তাওয়াফ করবে। পুরুষরা প্রথম তিন চক্করে রমল করবে (দ্রুত হাঁটবে) এবং সব চক্করে ইজতিবা করবে (ডান কাঁধ খোলা রেখে বাম কাঁধে চাদর রাখবে)।

রমল: ছোট ছোট কদমে দ্রুত হাঁটা।

ইজতিবা: চাদরের মধ্যভাগ ডান বগলের নিচে দিয়ে নিয়ে বাম কাঁধে দু'প্রান্ত ফেলে রাখা।

তাওয়াফের সময় আল্লাহর জিকির, তাসবিহ ও নিজের ইচ্ছামত দোয়া মনোযোগ সহকারে পড়বে। প্রতিবার হাজরে আসওয়াদে আসলে তাকবীর বলবে এবং রুকনে ইয়ামানি ও হাজরে আসওয়াদের মাঝে এ দুআ বলবে:

﴿...رَبَّنَآ ءَاتِنَا فِي ٱلدُّنۡيَا حَسَنَةً وَفِي ٱلۡأٓخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّارِ﴾

"হে আমাদের রব! আমাদেরকে দুনিয়াতে কল্যাণ দিন ও আখেরাতেও কল্যাণ দিন এবং আমাদেরকে

আগুনের শাস্তি থেকে রক্ষা করুন।“ [সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত: ২০১] তবে প্রতিটি চক্করের জন্য নির্দিষ্ট কোনো দোয়া নির্ধারণ করা হাদীস দ্বারা প্রমাণিত নয়, বরং তা একটি নতুন উদ্ভাবিত বিদ‘আত।

৫. তাওয়াফ শেষে মাকামে ইবরাহিমের পিছনে দুই রাক‘আত সালাত আদায় করবে, তার থেকে দূরে কোন স্থানে আদায় করলেও চলবে। প্রথম রাক‘আতে ফাতিহার পর পড়বে:

﴿قُلۡ يَـٰٓأَيُّهَا ٱلۡكَٰفِرُونَ ١﴾

“বলুন, ‘হে কাফিররা!” [সূরা আল-কাফিরূন, আয়াত: ১] দ্বিতীয় রাক‘আতে পড়বে:

﴿قُلۡ هُوَ ٱللَّهُ أَحَدٌ ١﴾

“বলুন ‘তিনি আল্লাহ্, এক-অদ্বিতীয়।“ [আল-ইখলাস, আয়াত: ১]

৬. এরপর সাফা ও মারওয়া পাহাড়ের মধ্যে সাত চক্কর সাঈ করবে। সাফা থেকে শুরু করবে, আর মারওয়াতে শেষ করবে।

সুন্নত হলো: উভয় পাহাড়ে উঠে কিবলামুখী হয়ে দাঁড়ানো, হাত উঠিয়ে আল্লাহর যিকির ও দোয়া করা।

পুরুষের জন্য সুন্নত হলো: দুটি সবুজ চিহ্নের মধ্যে দ্রুত দৌড়ানো।

৭. সাঈ শেষে মাথার চুল ছোট করে কাটবে। পুরুষরা সমস্ত মাথার চুল সমানভাবে কাটবে, মহিলারা এক

আঙ্গুল পরিমাণ কাটবে।

এতে উমরাহ সম্পন্ন হবে এবং ইহরাম থেকে হালাল হয়ে যাবে। ফলে ইহরামের পূর্বে যা কিছু হালাল ছিল (পোশাক, সুগন্ধি, স্ত্রী সহবাস ইত্যাদি) তা সবই করা যাবে।

(খ) হজ্জ

১. যিলহজ্জের ৮ তারিখে (তারবিয়ার দিন) যে স্থানে অবস্থান করছে সেখান থেকেই হজ্জের ইহরাম করবে। উমরাহর ইহরামের মত গোসল, সুগন্ধি ব্যবহার ও ইহরামের পোশাক পরিধান করবে।

২. এরপর হজ্জের নিয়ত করে বলবে: "লাব্বাইকাল্লাহুম্মা লাব্বাইক, লাব্বাইকা লা শারীকা লাকা লাব্বাইক, ইন্নাল হামদা ওয়ান নি'মাতা লাকা ওয়াল মুলক, লা শারীকা লাক, লাব্বাইকাল্লাহুম্মা হাজ্জান"।

পুরুষরা উচ্চস্বরে বলবে, মহিলারা নিচু স্বরে বলবে।

ঈদের দিন জামরায়ে আক্বাবা-তে কংকর নিক্ষেপ করা পর্যন্ত বেশি বেশি তালবিয়া পড়া সুন্নাত, তারপর তা পড়া বন্ধ করবে।

৩. এরপর মিনায় পৌঁছে সেখানে যোহর, আসর, মাগরিব, এশা ও ফজর সালাত আদায় করবে। চার রাকাত সালাত দুই রাকাত করে আদায় করবে, দুই ওয়াক্তকে জমা করে আদায় করবে না।

৪. ৯ তারিখ সূর্যোদয়ের পর আরাফাতের দিকে রওনা হবে। সম্ভব হলে নামিরায় অবস্থান করবে যোহর পর্যন্ত,

নতুবা সরাসরি আরাফায় অবস্থান করবে। যোহরের সময় হলে যোহর ও আসর সালাত (কসর করে ও একত্রে) আদায় করবে। এরপর কিবলামুখী হয়ে আল্লাহর জিকির ও দোয়ায় মশগুল হবে (পাহাড় পিছনে থাকলেও সমস্যা নেই) সূর্যাস্ত পর্যন্ত।

৫. সূর্যাস্তের পর মুযদালিফার উদ্দেশে রওনা দিবে, সেখানে পৌঁছে মাগরিব (৩ রাকাত) ও এশা (২ রাকাত) সালাত আদায় করবে। সেখানে রাত্রি যাপন করবে। ফজর সালাতের পর ভোর হওয়া সুস্পষ্ট হওয়া পর্যন্ত আল্লাহর জিকির ও দোয়ায় মশগুল থাকবে।

৬. ভোর স্পষ্ট হলে মিনার দিকে রওনা হবে। সেখানে পৌঁছে প্রথমে জামারা আক্বাবা (মক্কার নিকটতম জামরা)-তে পরপর সাতটি কংকর নিক্ষেপ করবে। কংকরগুলো হবে, ছোলার চেয়ে কিছুটা বড় আকারের। প্রতিটি নিক্ষেপের সাথে তাকবীর বলবে।

কংকর নিক্ষেপ শেষে হাদি যবেহ করবে (যদি থাকে)। তারপর মাথা মুণ্ডন করবে বা চুল কাটবে। তবে মাথা মুণ্ডন করা উত্তম। কিন্তু মহিলারা ভিন্ন, তারা এক আঙ্গুল পরিমাণ তাদের মাথার চুল কাটবে।

কংকর নিক্ষেপ ও মাথা মুন্ডানো বা চুল কাটার মাধ্যমে ইহরাম থেকে প্রথম পর্যায়ের হালাল হবে। তখন স্বাভাবিক পোশাক পরা, সুগন্ধি ব্যবহার ইত্যাদি করা যাবে। তবে স্ত্রী সহবাস তখনো হালাল হবে না।

এরপর মক্কায় গিয়ে হজ্জের তাওয়াফ ও সাফা-মারওয়ার সাঈ করবে; উমরাহর তাওয়াফ ও সাঈর মত,

তবে এতে রমল ও ইজতিবা করবে না। কারণ রমল ও ইযতিবা শুধুমাত্র প্রথম আগমনের তাওয়াফে সুন্নাত, অন্য কোনো তাওয়াফে এগুলো প্রযোজ্য নয়।

তাওয়াফ ও সাঈ শেষে ইহরাম থেকে দ্বিতীয় (চূড়ান্ত) পর্যায়ের হালাল হয়ে যাবে। তখন স্ত্রী সহবাসসহ ইহরামের আগে যা কিছু হালাল ছিল সবকিছুই হালাল হবে।

ঈদের দিনে পালনীয় হজের কাজের সারসংক্ষেপ:

জামরায়ে আকাবায় কঙ্কর নিক্ষেপ।

কুরবানি করা।

মাথা মুণ্ডন/চুল কাটা।

তাওয়াফ ও সাঈ করা।

এসব কাজ উল্লিখিত ক্রম অনুযায়ী ধারাবাহিকভাবে করা সুন্নাত; তবে ব্যতিক্রম হলে সমস্যা নেই।

৭. মিনায় ১১ ও ১২ই জিলহজের রাত্রি যাপন করবে।

৮. ১১ই ও ১২ই জিলহজ তারিখে যোহরের পর তিনটি জামারায় (পাথর নিক্ষেপস্থলে) কঙ্কর নিক্ষেপ করবে। প্রথমে প্রথম জামারা থেকে শুরু করবে, যা মক্কা থেকে সবচেয়ে দূরে অবস্থিত। সেখানে সাতটি কঙ্কর একের পর এক নিক্ষেপ করবে এবং প্রতিটি কঙ্কর নিক্ষেপের সময় 'আল্লাহু আকবার' বলবে।

এরপর ভিড় থেকে একটু সামনে এগিয়ে যাবে, কিবলার দিকে মুখ করে হাত উঁচু করে দীর্ঘ সময় ধরে ইচ্ছামতো দোয়া করবে।

তারপর দ্বিতীয় জামারাতে কঙ্কর নিক্ষেপ করবে

এবং প্রথমটির মতো দোয়া করার জন্য থামবে।

অতঃপর তৃতীয় জামারাতে -যেটাতে ঈদের দিন কংকর নিক্ষেপ করা হয়েছিল- আগের দুইটির মতো কঙ্কর নিক্ষেপ করবে, তবে এখানে দোয়ার জন্য থামবে না।

৯. যদি ১২ই জিলহজ তারিখে তিনটি জামারায় পাথর নিক্ষেপ সম্পন্ন করে, তাহলে চাইলে সে মিনায় ১৩ই জিলহজ পর্যন্ত অবস্থান করতে পারে এবং ওই দিনও যোহরের পর জামারায় পাথর নিক্ষেপ করবে। এটি উত্তম; কারণ এটি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর আমল এবং এতে নেক আমল বৃদ্ধি পায়। আর চাইলে সে দুই দিনেই (১১ ও ১২ তারিখে) কঙ্কর নিক্ষেপ করে তাড়াতাড়ি মিনার কাজ শেষ করতে পারে — তবে সে ক্ষেত্রে ১২ তারিখ সূর্যাস্তের আগেই মিনা ত্যাগ করতে হবে।

মীনায় অবস্থানের এ সমস্ত দিন ও রাত্রিতে তাকবীর ও জিকির বেশি বেশি করা উচিত। কারণ আল্লাহ তাআলা বলেন:

﴿وَٱذۡكُرُواْ ٱللَّهَ فِيٓ أَيَّامٖ مَّعۡدُودَٰتٖ...﴾

“আর তোমরা (হজ্জের) নির্ধারিত দিনগুলোতে আল্লাহকে স্মরণ করো।“ [সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত: ২০৩] আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

«أَيَّامُ التَّشْرِيقِ أَيَّامُ أَكْلٍ، وَشُرْبٍ، وَذِكْرِ اللهِ».

“আইয়্যামে তাশরীক হচ্ছে পানাহার ও আল্লাহর যিকির করার দিন।”[1]

আর এভাবেই হজ্জের সকল কাজ সম্পন্ন হলো।

বিদায়ী তাওয়াফ

হাজী যখন হজ্জের সমস্ত কাজ সম্পন্ন করে নিজ দেশে ফিরতে চায়, তখন মক্কা থেকে বের হওয়ার আগে বাইতুল্লাহর বিদায়ী তাওয়াফ করবে, যা হবে তার শেষ কাজ।

তবে হায়েজ ও নেফাসগ্রস্ত নারীর জন্য বিদায়ী তাওয়াফ জরুরি নয়, ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুমা থেকে বর্ণিত: “মানুষদেরকে আদেশ দেওয়া হয়েছে, যেনো তাদের সর্বশেষ কাজ হয় বায়তুল্লাহর (বিদায়ী) তাওয়াফ। তবে ঋতুবতী নারীর জন্য এ বিষয়ে শিথিল (মাফ) করা হয়েছে।”[2]

ইহরাম অবস্থায় নিষিদ্ধ বিষয়সমূহ:

ইহরাম অবস্থায় নিষিদ্ধ কাজসমূহ: ইহরামের কারণে যেসব কাজ করা নিষিদ্ধ সেগুলোকে ইহরাম

---

1 সহীহ মুসলিম, অধ্যায়: সাওম, পরিচ্ছেদ: আইয়ামুত তাশরীকে সাওম পালন হারাম, হাদীস নং (১১৪১) নূবায়শা আল-হুযালী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত হাদীস।

2 সহীহ বুখারী, অধ্যায়: হজ, পরিচ্ছেদ: বিদায়ী তাওয়াফ, হাদীস নং (১৭৫৫); সহীহ মুসলিম, অধ্যায়: হজ, পরিচ্ছেদ: বিদায়ী তাওয়াফ ফরয হওয়া প্রসঙ্গে, হাদীস নং (৩৮০/১৩২৮)।

অবস্থায় নিষিদ্ধ কাজ বলা হয়।

ইহরাম অবস্থায় নিষিদ্ধ বিষয়গুলো সংক্ষেপে নিম্নরূপ:

১. মাথার চুল কাটা বা মুণ্ডানো। অধিকাংশ আলেমের মতে শরীরের অন্যান্য লোমও অন্তর্ভুক্ত।

২. হাত-পায়ের নখ কাটা। অধিকাংশ আলেম সৌন্দর্যের দিক থেকে একে চুলের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ দেখিয়েছেন।

৩. ইহরামের পর দেহ, কাপড়, খাদ্য বা পানীয়ে সুগন্ধি ব্যবহার।

৪. হাত মোজা পরিধান করা।

৫. কামোদ্দীপনার সাথে স্পর্শ করা।

এই পাঁচটি নিষিদ্ধ কাজের লঙঘনের ক্ষেত্রে ফিদিয়া দেওয়ার নিয়ম ইখতিয়ারের (বিকল্প গ্রহণের) উপর নির্ভর করে, যেমন আল্লাহ তাআলা কুরআনে মাথা মুণ্ডানোর প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছেন। বাকি নিষিদ্ধ কাজগুলোকেও একই নিয়মের আওতায় গণ্য করা হয়েছে। এতে তিনটি কাজের যেকোনো একটিকে বেছে নেওয়ার অনুমতি রয়েছে: তিন দিন রোযা রাখা, ছয়জন মিসকিনকে খাদ্য দান করা — প্রত্যেককে অর্ধ সা‘ করে, অথবা একটি ছাগল বা বকরী জবাই করা। এই খাদ্য বা জবাইকৃত পশুর গোশত গরীবদের মাঝে বিতরণ করা হবে — তা মক্কায় হোক বা সেই স্থানে যেখানে নিষিদ্ধ কাজটি সংঘটিত হয়েছে।

৬. যৌন মিলন: হজ্জে প্রথম পর্যায়ের হালাল হওয়ার

পূর্বে এ কাজ করলে চারটি বিষয় প্রযোজ্য হবে:

• যে হজ্জে সহবাস করা হয়, সে হজ্জ বাতিল হয়ে যাবে।

• হজের অবশিষ্ট কাজ অবশ্যই সম্পূর্ণ করতে হবে।

• পরবর্তী বছর পুনরায় হজ্জ করা আবশ্যক।

• একটি উট কুরবানি করবে; যা মক্কায় বা মিলনের স্থানে মিসকীনদের মাঝে বিতরণ করবে।

৭. বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া: এতে কোনো ফিদইয়া নেই। তবে বিবাহ বাতিল হয়ে যাবে; স্বামী/স্ত্রী/অভিভাবক/প্রতিনিধি যে কেউ মুহরিম হোক না কেন।

৮. বন্য প্রাণী শিকার: এ জন্য সমতুল্য প্রাণী যবেহ করতে হবে। হারামের ফকিরদের মধ্যে তা বিতরণ করবে, বা তার মূল্য পরিমাণ খাদ্য বিতরণ করবে অথবা প্রতি মিসকীনকে খাদ্য দেয়ার পরিবর্তে একদিন করে রোজা রাখবে।

এই আটটি নিষিদ্ধ কাজ সকল ইহরামকারীর জন্য হারাম, পুরুষ হোক বা নারী হোক। তবে পুরুষদের জন্য নিম্নোক্ত দুটি অতিরিক্ত নিষেধাজ্ঞা প্রযোজ্য:

১. এমন কোনো বস্তু দিয়ে মাথা ঢাকা যা মাথায় লেগে থাকে। যেমন: টুপি বা রুমাল। তবে যা মাথার সাথে লেগে থাকেনা (যেমন তাবু, গাড়ির ছাদ বা ছাতার নিচে থাকা) তাতে কোনো সমস্যা নেই।

২. সেলাইকৃত পোশাক পরা:

শরীর বা কোন অঙ্গের মাপে সেলাই করা পোশাক,

যেমন: শার্ট, প্যান্ট, মোজা ইত্যাদি পরিধান করা। তবে তালিযুক্ত ইজার-রিদা পরতে কোনো বাধা নেই। আংটি, ঘড়ি, চশমা, ইয়ারফোন বা টাকার ব্যাগ ব্যবহারে সমস্যা নেই।

নারীদের জন্য বিশেষভাবে নিষিদ্ধ হলো:

মুখমণ্ডল ঢাকা , যেকোনো পদ্ধতিতে। তবে কিছু আলেম শুধু নিকাবকে (চোখের ছিদ্রযুক্ত মুখ ঢাকনি) নিষিদ্ধ বলেছেন।

সর্বোত্তম হলো, মুখমণ্ডল একেবারেই না ঢাকা। তবে অ-মাহরাম পুরুষের সামনে পড়লে ইহরাম অবস্থায় বা সাধারণ অবস্থায়ও মুখ ঢাকতে হবে।

এই বিশেষ নিষেধাজ্ঞাগুলোর ফিদইয়া পূর্ববর্তী পাঁচটি নিষিদ্ধ কাজের ফিদইয়ার মতোই।

নিষিদ্ধ কাজে পতিত ব্যক্তির বিধান:

যে ব্যক্তি এসব নিষিদ্ধ কাজ করে তার তিনটি অবস্থা হতে পারে:

প্রথমত: যদি কোনো প্রয়োজন বা বৈধ অজুহাত ছাড়া নিষিদ্ধ কাজ করে, তাহলে সে গুনাহগার হবে এবং তার উপর ফিদিয়া ওয়াজিব হবে।

দ্বিতীয়ত: প্রয়োজন বা ওজরের কারণে করলে গুনাহ হবে না, তবে ফিদইয়া ওয়াজিব হবে। আল্লাহ তাআলা বলেন:

﴿...فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ بِهِۦٓ أَذًى مِّن رَّأْسِهِۦ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ

صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ...﴾

“কোনো লোক যদি অসুস্থ হয় বা তার মাথা যন্ত্রণাগ্রস্ত হয়, তবে সে সাওম কিংবা সাদকা অথবা কুরবানী দ্বারা তার বিনিময় (ফিদইয়া) আদায় করবে।” [সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত: ১৯৬] সুতরাং যদি কেউ শীত বা গরম থেকে সুরক্ষার জন্য মাথা ঢাকার প্রয়োজন বোধ করে, তবে তার জন্য মাথা ঢাকা জায়েয হবে, কিন্তু পূর্বে উল্লিখিত পদ্ধতিতে ফিদইয়া দিতে হবে।

তৃতীয়ত: যদি কেউ অজ্ঞতাবশতঃ, ভুলে, জোরপূর্বক বা ঘুমের অবস্থায় নিষিদ্ধ কাজ করে, তবে তার উপর কোন গুনাহ বা ফিদইয়া নেই। আল্লাহ তাআলা বলেন:

﴿...رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَآ إِن نَّسِينَآ أَوْ أَخْطَأْنَا...﴾

“হে আমাদের রব! যদি আমরা বিস্মৃত হই অথবা ভুল করি তবে আপনি আমাদের পাকড়াও করবেন না।” [সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত: ২৮৬] হাদীসের এসেছে, নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

«إِنَّ اللهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ».

“নিশ্চয় আল্লাহ আমার উম্মাতের ভুল, বিস্মৃতি ও জোরপূর্বক যা করানো হয় তা ক্ষমা করে দিয়েছেন।”[1]

কিন্তু যখন ওজর দূর হবে, অর্থাৎ যখন সে নিষিদ্ধ

---

[1] ইবন মাজাহ, অধ্যায়: তালাক, পরিচ্ছেদ, জোরপূর্বক ও ভুলে যাওয়া ব্যক্তির তালাক, হাদীস নং (২০৪৩) ও (২০৪৫) আবূ যার ও ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত হাদীস।

বিষয়টি জানতে পারবে, স্মরণ করবে, বা জোর-জবরদস্তি দূর হবে কিংবা ঘুম থেকে জাগ্রত হবে, তখনই তাকে অবিলম্বে সেই নিষিদ্ধ কাজ বন্ধ করতে হবে।

মসজিদে নববীর যিয়ারত:

মসজিদে নববী তিনটি সম্মানিত মসজিদের একটি, যেগুলোর উদ্দেশ্যে সফর করা বৈধ ও প্রশংসনীয়। এই তিনটি মসজিদ হলো: মক্কায় অবস্থিত মসজিদে হারাম, মদীনায় মসজিদে নববী এবং জেরুজালেমে মসজিদে আকসা। মসজিদে নববীতে একটি সালাত অন্যান্য মসজিদে আদায়কৃত এক হাজার সালাতের চেয়ে উত্তম — মসজিদে হারাম ছাড়া।

এই ফজিলতের কারণে মসজিদে নববী সফর ও তাতে সালাত আদায় করা সব সময়ই শরিয়তসম্মত। এটি শুধু হজের সময়ের জন্য নির্দিষ্ট নয় এবং এর হজের সঙ্গে সরাসরি কোনো সম্পর্কও নেই। হজ তার সম্পূর্ণতা পায় মসজিদে নববী সফর ছাড়াও, এবং এটি না করলেও হজ অসম্পূর্ণ হয় না।

তবে মানুষ সাধারণত মসজিদে নববী সফরকে হজ সফরের সঙ্গেই যুক্ত করে নেয়, যাতে একই সফরে দুটিই আদায় করা যায় — বিশেষ করে দূর-দূরান্তের মানুষদের জন্য, যাদের জন্য আলাদা করে দুটি সফর করা কষ্টসাধ্য।

মসজিদে প্রবেশের পর প্রথমে ইচ্ছামতো সালাত আদায় করবে। এরপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম -এর কবরের সামনে গিয়ে দাঁড়াবে এবং বলবে:

“আসসালামু আলাইকা আইয়্যুহান নাবিয়্যু ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদিও ওয়া আলা আ-লি মুহাম্মাদিন, কামা সাল্লাইতা আলা ইব্রাহীমা ওয়া আলা আলি ইব্রাহীমা, ইন্নাকা হামিদুম মাজিদ।

ওয়া বারিক আলা মুহাম্মাদিও ওয়া আলা আ-লি মুহাম্মাদিন, কামা বারাকতা আলা ইব্রাহীমা ওয়া আলা আলি ইব্রাহীমা, ইন্নাকা হামিদুম মাজিদ”।

অর্থ “হে নবী ! আপনার উপর সবধরনের নিরাপত্তা, রহমত ও বরকত বর্ষিত হোক।”

“হে আল্লাহ! আপনি মুহাম্মাদের ওপর এবং মুহাম্মাদের বংশধরদের ওপর রহমত বর্ষণ করুন, যেরূপ আপনি ইবরাহীম এবং ইবরাহীমের বংশধরদের ওপর রহমত বর্ষণ করেছেন। নিশ্চয়ই আপনি অতি প্রশংসিত, অত্যন্ত মর্যাদার অধিকারী। হে আল্লাহ! মুহাম্মাদ এবং মুহাম্মাদের বংশধরদের ওপর তেমনি বরকত দান করুন যেমনি আপনি বরকত দান করেছেন ইবরাহীম এবং ইবরাহীমে বংশধরদের ওপর। নিশ্চয়ই আপনি অতি প্রশংসিত, অতি মর্যাদার অধিকারী।”

এরপর ডান দিকে একটু সরে গিয়ে হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু-কে সালাম দিবে এবং বলবে:

"আসসালামু আলাইকা ইয়া আবা বকর, ইয়া

খলীফাতা রাসূলিল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, রাদিয়াল্লাহু আনকা, ওয়া জাযাকা আন উম্মাতি মুহাম্মাদিন খাইরা।"

অর্থাৎ হে আবু বকর! আল্লাহর রাসূলের খলিফা, আপনার উপরে সালাম বর্ষিত হোক, আল্লাহ আপনার উপর সন্তুষ্ট হোন এবং আপনাকে উম্মতে মুহাম্মাদীর পক্ষ থেকে উত্তম প্রতিদান দান করুন।”

আবার ডান দিকে একটু সরে গিয়ে হযরত উমার রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু-কে সালাম দিবে এবং বলবে:

"আসসালামু আলাইকা ইয়া আমীরাল মু'মিনীন উমার, রাদিয়াল্লাহু আনকা, ওয়া জাযাকা আন উম্মাতি মুহাম্মাদিন খাইরা।"

অর্থাৎ হে আমীরুল মুমিনীন উমার! আপনার উপরে সালাম বর্ষিত হোক, আল্লাহ আপনার উপর সন্তুষ্ট হোন এবং আপনাকে উম্মতে মুহাম্মাদীর পক্ষ থেকে উত্তম প্রতিদান দান করুন।”

যিয়ারতকারীর জন্য উপযুক্ত যে, তিনি পবিত্র অবস্থায় কুবার উদ্দেশে রওয়ানা করে সেখানে যাবেন এবং সালাত আদায় করবেন।

তদ্রূপ, যিয়ারতকারী ব্যক্তি ‘বাকী’ কবরস্থান যিয়ারত করবে, যা মদীনা মুনাওয়ারার কবরস্থান। সেখানে গিয়ে উসমান (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-কে সালাম পেশ করবে এবং তার কবরের কাছে পৌঁছে বলবে :"আসসালামু আলাইকা ইয়া আমীরাল মু'মিনীন উসমান, রাদিয়াল্লাহু আনকা, ওয়া জাযাকা আন উম্মাতি মুহাম্মাদিন খাইরা।"

অর্থাৎ হে আমীরুল মুমিনীন উসমান! আপনার উপরে সালাম বর্ষিত হোক, আল্লাহ আপনার উপর সন্তুষ্ট হোন এবং আপনাকে উম্মতে মুহাম্মাদীর পক্ষ থেকে উত্তম প্রতিদান দান করুন।

এরপর বাকী কবরস্থানের অন্যান্য মৃতদের সালাম জানাবে এবং তাদের জন্য ক্ষমা ও দয়ার দোআ করবে।

উহুদে গিয়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর চাচা হযরত হামযা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু এবং অন্যান্য শাহাদাতপ্রাপ্ত সাহাবাদের কবর যিয়ারত করবে, তাদের উপর আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য দোয়া করবে এবং তাদের জন্য ক্ষমা ও রহমতের দোয়া করবে।

মহিলাদের জন্য কবর যিয়ারত করা অনুমোদিত নয় — না নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর কবর, না অন্য কোনো কবর।

আমরা ইতঃপূর্বে যে সকল স্থানের কথা উল্লেখ করেছি (মেসজিদে নববী, কুবা মসজিদ, জান্নাতুল বাকী ও উহুদ) - এগুলো ছাড়া মদিনায় সাওয়াবের উদ্দেশ্যে যাওয়ার মত শরীয়তসম্মত কোনো বিশেষ দর্শনীয় স্থান নেই।

আল্লাহই তাওফিকদাতা।

আল্লাহর রহমত ও শান্তি বর্ষিত হোক আমাদের নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, তার পরিবার-পরিজন এবং সকল সাহাবীর উপর।

রচনায় (আল্লাহর দয়ার মুখাপেক্ষী):

মুহাম্মাদ আল-সালেহ আল-উসাইমিন

সূচিপত্র





رسالة الحرمين

হারামাইন বার্তা

উল-হারাম এবং মসজিদে নববী অভিমুখী যাত্রীদের জন্য
নির্দেশিকা বিষয়বস্তু বিভিন্ন ভাষায়.





